১৭-০৫-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। তোমাদের যেমন লাগাতার বাবার স্মরণে থাকতে হবে, তেমনি চতুর্দিকে জ্ঞান-রত্নের বীজও বপন করতে হবে। এ ভাবে সম্পূর্ণ ভারতকেই জ্ঞান-রত্নে সাজিয়ে তুলতে হবে

প্রশ্ন :- বর্তমানের এই কলিযুগী গোবর্ধন-পর্বতকে ওঠাবার জন্য তোমাদের কি ধরণের আঙ্গুলের সাহায্য দিতে হয় ?

উত্তর :- পবিত্রতার। পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করার অর্থই আঙ্গুলের সাহায্য দেওয়া। এই পবিত্রতা না থাকার কারণেই, ভারত আজ এমন দৈন্যদশা অবস্থায় পৌঁছেছে। যেখানে পবিত্রতা - সেখানেই শান্তি-সমৃদ্ধি সব কিছুই বজায় থাকে। অতএব শ্রীমৎ অনুসারে চলে, আগুন আর কাপাস-তুলোর ফলের মতন একত্রে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে, অর্থাৎ প্রবৃত্তিতে থেকেও পবিত্র হতে হবে। এর অর্থ ঘর-সংসারের সন্ন্যাস করা নয় কিন্তু।

গীত :- আগামী সৌভাগ্যের প্রতিচ্ছবি
. যে তোমরাই .....

ওঁম্ শান্তি! মাতারা সমেত সকল প্রেমিকারাই তো এই গীত শুনলে। বাচ্চারা, তোমরা তো জানই, আমাদের এই ভারতের ভাগ্যে বন্ধ্যাত্বের দাগ লেগে আছে। কিন্তু বন্ধ্যাত্বের দাগ কি আর তা লাগলোই বা কার দ্বারা ? ৫-বিকাররূপী রাবণের দ্বারা। বাচ্চারা- তোমরা এখন আবার ভারতের সেই পুরোনো গৌরব ও সৌভাগ্য তৈরী করছো। আর তোমরা মাতারাই হলে সেই শিবশক্তি। জ্ঞান-সাগর বাবা যখন আসেন, এসেই আগে মাতাদের মাথায় জ্ঞানের কলস রাখেন। বাচ্চারা, তোমরা নিজেরাও তা জানো, তোমরাই ভারতকে সৌভাগ্যবান বানিয়ে স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত কর, অর্থাৎ তোমরাই বাবার প্রকৃত রুহানী-সেনানী যা বাবার ঘরের শোভা। যেমন মা-বাবার কাছে বাচ্চা না থাকলে ঘর একেবারে ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয় - তেমনি বাবারও দুনিয়া খালি-খালি মনে হয় তোমাদের ছাড়া। বাচ্চারা, এবার তোমরা এই দুনিয়াকেই স্বর্গ-রাজ্য বানাতে চলেছো। তাই বাবা বলছেন- মাতারা, আমি তোমাদের গোলাম, যেহেতু পূর্বে তোমরা মাতারা নিজেদের পতিদের গোলাম ছিলে। এ কথা তো প্রচলিতই আছে, হিন্দু নারীদের গুরু তাদের পতি - কিন্তু এখন জ্ঞান হয়েছে বাস্তবে ঈশ্বরই যে সবকিছু তাদের। বাস্তবে, এখনকার কথাকেই লোকেরা সেই ভক্তি-মার্গেই নিয়ে যাচ্ছে। অথচ এখন তো তোমরা পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলবে, "ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ত্বমেব।" অর্থাৎ হে পরমপিতা পরমাত্মা, তুমিই আমাদের মাতা আবার পিতাও যে তুমি, একমাত্র তুমিই আমাদের সবকিছু। যদিও হিন্দুরা সর্বদাই বলে আসছে, পতিই তাদের সবকিছু। বাস্তবে তো শিববাবাই সব পতিদেরই পতি। তাই তো তোমরা সর্বদাই সৌভাগ্যশালী হতে পারো, যেহেতু এই পতি অমর পতি অর্থাৎ তোমরা কখনও বিধবা হও না। তাই তো উনি "অমরনাথ।" উনি এমনই অমরনাথ যে, তোমাদেরও সেই অমরপুরীর মালিক করে অমরনাথ বানিয়ে দেন। অতএব এমন পতিকে অবশ্যই সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে, যে তোমাদেরকে পড়িয়ে-শুনিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানিয়ে দেয়। আর এমন পতিকে ভুলে গেলে তো কাঁদতেই হবে। তাই তখন বাবা বলছেন - কি হলো, তোমার এই প্রেমিক কি মরে গেছে যে তুমি কাঁদতে বসেছো ? তোমাদের তো এখন থেকে সর্বদা হর্ষিতমুখ

থাকতে হবে। যেমন দেবতারা সদাই হর্ষিতমুখ থাকে। যাকে দেখলেই মানুষের মন খুশীতে ভরে যায়। কিন্তু দেবতারা কোত্থেকে পেল এত খুশী ? -- সঙ্গমে বাবা তাদেরকে এত হর্ষিতমুখ আর আনন্দ-স্বরূপ বানান। তাই এখন থেকে পুরুষার্থ করতে থাকলে তবেই তো এমন অবিনাশী হতে পারবে। বাবা আরও জানাচ্ছেন - কান্না-কাটির কোনও ব্যাপারই নেই এতে। বাঃ, বাবার মতন এমন সৌম্য-দর্শনের প্রেমিক যেখানে পেয়েছো, যিনি আবার স্বর্গ-রাজ্যের মহারাজা-মহারাণীও বানান তোমাদের। অতএব তোমরা কেবল প্রতি পদক্ষেপেই তার শ্রীমত অনুসারে চলতে থাকো। তোমরা যা ভারশন (Version, আক্ষরিক অর্থের তর্জমা) শুনতে পাও, তার এক-একটি ভারশন লাখ-লাখ টাকার। জাগতিক বিদ্বান লোকেরা গীতা, বেদ-বেদান্ত ইত্যাদি শুনিয়ে থাকে, আর বলে- এর এক-একটি ভ্যারশন লাখ টাকার, যদিও তোমাদের তা দিতে হয় না মোটেই।

বাচ্চারা, তোমরা প্রত্যেকেই এক-একজন রূপ-বসন্ত। আত্মা যেমন রূপ, বাবাও তেমনি রূপ, তার উপর বাবা হলেন জ্ঞানেরও সাগর। যেহেতু উনি-ই সেই জ্ঞানের বর্সা করান। যা কোনও স্থুল-বস্তু বা জলের বর্সা নয়। এই বর্সাকে বলা হয় জ্ঞান-রত্নের বর্সা। তোমাদেরও তেমনি অন্যদের মধ্যে সেই জ্ঞান-রত্নের বীজ বপন করতে হবে। লোকেদের বোঝাতে হবে, প্রকৃত অর্থে তারা আত্মা, আর এটা তাদের (আত্মার) শরীর। লোকেরাই তো বলে, পাপ-আত্মা বা পুণ্য-আত্মা, কিন্তু এমনটা কেউ-ই বলে না যে, পাপ-পরমাত্মা বা পুণ্য-পরমাত্মা। এতেই তো প্রমাণ হয়ে যায় - পরমাত্মা সর্বব্যাপী নয়। মায়াই তোমাদেরকে পাপ-আত্মা বানায় - আর বাবা আবার তাকে পুণ্য-আত্মা বানায়। পুণ্য-আত্মাদের জগৎকে স্বর্গ-রাজ্য আর পাপ-আত্মাদের দুনিয়াকে নরক বলা হয়। সবাইকে পবিত্র বানাবার কারিগর ও সদগতি দাতা একমাত্র এই বাবা। তাই তো তোমরা সেই অসীম-বেহদের বাবার ঘরের শোভা। ভারতকেও তেমনি সুন্দর করে জ্ঞান-রত্নে সাজিয়ে তুলতে হবে তোমাদেরকেই। লোকেরা তো জগতের সাত আশ্চর্য দেখিয়ে থাকে - যা মনুষ্য দ্বারা সৃষ্টি। বাস্তবে কিন্তু বৈকুন্ঠ-কেই তো বলা হয় পৃথিবীর আশ্চর্য। যেখানে সবাই সদা খুশী। তাই লোকেরা বলে, অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু বাবা স্বয়ং যতক্ষণ না আসছেন, ততক্ষণ তো ওখানে কেউ-ই যেতে পারে না। বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই জানো-কখন ও কিভাবে সেখানে পৌঁছতে পারা যায়। লোকেরা তো চর্মচক্ষুর দ্বারা জাগতিক আশ্চর্য দেখতে হয়, কিন্তু তোমরা বৈকুন্ঠে পৌঁছে সেখানকার অফুরন্ত সুখ ভোগ কর। সেখানে কান্না-কাটির নাম-গন্ধও নেই। বাবা তাই বোঝাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমরা যেখানে পরমপিতা পরমাত্মার প্রেমিকা, সেখানে কান্না-কাটি করবেই বা কেন ? তখন বোধহয় তোমরা এই প্রেমিককে ভুলে যাও, তাই এমন হয়। প্রেমিককে ভুলে যাওয়ার অর্থই হলো, প্রেমিকের থেকে বিদায় নেওয়া। লাগাতার ওনাকে স্মরণ করতে থাকলে, কান্না-কাটির প্রশ্নই আসবে না। যদি কারও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সম্বন্ধ-সম্পর্কের কেউ মারা যায়, একমাত্র তখনই তো সে কান্না-কাটি করবে। তাই এখানে তোমরা জীবিত থাকাকালীনই তাদের সবার থেকেই থেকে ছুটি নিয়ে নাও। আর কাঁদতে-কাঁদতে আবার সদা কালের জন্য হাঁসার বন্দোবস্ত কর। কেন না তোমরা তখন বৈকুন্ঠে পৌঁছে যাও যে। সেখানে কোনও প্রকারের কান্না-কাটির কোনও অবস্থাই আসে না। তাই তো বাবা বলেন- "মা মরলেও হালুয়া খাও"! কিন্তু তা কোন হালুয়া ? -জ্ঞানের হালুয়া।

বাস্তবে সবাই এখন মৃত্যুর দোরগোড়ায়। কার কথাই বা কে ভাববে ? কারও কথা ভেবেও লাভ নেই। সবাইকেই যে মরতেই হবে। এমন কি তখন কোনও প্রকার ক্রিয়া-কর্ম করারও কেউ থাকবে না। যেমন জাপানে যখন ব্যোম্ পড়েছিল, তখন যে এত লোকের মৃত্যু ঘটেছিল, তখন কি কেউ

কোনও ক্রিয়া-কর্ম করেছিল ? ক্রিয়া-কর্ম করার যারা, তারও তো সব মরবে। এই ক্রিয়া-কর্ম তো কেবলমাত্র ভক্তি-মার্গের সামাজিক রীতি-নীতি, ও আচার-ব্যবহার। সত্যযুগে কিন্তু এমন কোনও ঘটনা ঘটে না। সেখানে কেবলই সুখ আর অপার সুখ। মোহজীত রাজার কাহিনীও সেখানকার এবং সেই সময়কার। যা তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে শুনে আসছো। তাই বাবা বলছেন- এ যাবৎ যা কিছুই শুনেছো, সেসব ভুলে যাও। এখন কেবলমাত্র বাবার কথাই শোনো। "মন্দ কিছু শুনবে না - মন্দ কিছু দেখবে না - মন্দ কিছু বলবে না" ..... যা লোকেরা বাঁদরের চেহারাতে এক ধরণের খেলনা পুতুল বানিয়েছে। "মন্দ কিছু বলবে না, মন্দ কিছু দেখবে না" ..... যেহেতু মানুষ এখন বাঁদরের চাইতেও নিম্ন-স্তরের। যে যা কিছুই শোনাক, তাতেই সত্য-সত্য বলতে থাকে লোকেরা। তাই বাবা বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলে-বাচ্চারা, কেউ যেন তেমাদের নামে কোনও প্রকারের গ্লানি না করে। আরও জানাচ্ছেন - পুরো কল্পে একমাত্র এই সঙ্গমযুগেই আসেন উনি। এই সময়ে ওনার কর্ম-কর্তব্যের নিমিত্তে বাবাকে অবশ্যই আসতেই হয়, তবেই তো পারবেন এই জ্ঞান শোনাতে। কিছু লোকেরা বলে- ঋষি-মুনী, সাধু-সন্ন্যাসীরা ত্রিকাকদর্শী ছিল। বাবা বলেন- "মোটেও তা নয়।" এমন কি লক্ষ্মী-নারায়ণও ত্রিকালদর্শী ছিলেন না। ত্রিকালদর্শী তো কেবল তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরা হতে পারো। যেহেতু এই জন্মটাই তোমাদের ৮৪-জন্মের অন্তিম জন্ম। আবার এমনও নয় যে, এই জ্ঞানের সংস্কার অন্য জন্মেও থাকবে। তা মোটেই নয়। এই জ্ঞায় প্রায় লোপ পেয়ে যায়। স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব স্থাপন হয়ে গেলেই, রাজযোগের আর প্রয়োজন থাকে না। এবার নিজেরাই ভেবে দেখ, বাবা কি জানাচ্ছেন, আর জাগতিক লোকেরাই বা কি বলে- যা রাত-দিনের তফাৎ। যেমন লোকেরা বলে - পরমাত্মা সর্বব্যাপী, বাবা সম্পূর্ণরূপে তা অস্বীকার করেন। লোকেরা বলে - কলিযুগের আয়ু এখনও ৪০-হাজার বছর অবশিষ্ট বাবা বলেন- মোটেও তা নয়। এমনই গাল-গপ্পোর কারণে, প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে জগত-সংসার এখন ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে।

মিষ্টি বাবা এবার বলছেন - বাচ্চারা, তোমাদেরও খুব মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে। তোমরা ঈশ্বরীয় দরবারের ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমাদের প্রধান কর্তব্যই হলো যোগযুক্ত থাকা। গোবর্দ্ধন পর্বতে গেলে সেখানে চিত্র দেখতে পাবে, প্রত্যেকেই তাদের আঙ্গুলের সহযোগ দিচ্ছে সেই পর্বতে। পর্বতেরও পূজা হয় সেখানে। ভারতে যখন স্বর্ণযুগ শুরু হবে, তারপর পর্বতের পূজা বন্ধ হয়ে যাবে। সেই আঙ্গুলের ইঙ্গিত তোমাদেরকে উদ্দেশ্য করে। পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করা অর্থাৎ আঙ্গুলের সহযোগ, যার অর্থ ভারতকে সৌভাগ্যশালী বানানো। পবিত্রতা থাকলে শান্তি ও সমৃদ্ধিও আসে। এই পবিত্রতা না থাকার কারণে ভারতের আজ কি করুণ দৈন্য-দশা দেখো, যদিও তা কষ্টসাধ্য। জাগতিক সন্ন্যাসীরা বলে, আগুন আর কাপাস-তুলোর ফল একত্রে থাকতে পারে না। শাস্ত্রগুলিতে তেমনই লেখা আছে। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তোমাদের ব্যবহারে তাদেরকে দেখাতে পারো- দেখো, আগুন আর কাপাস তুলোর ফল একসাথেই কত সুন্দর ভাবে পবিত্র থাকতে পারে। সন্ন্যাসীরা কিন্তু বাবার এই শ্রীমৎ পায় না। তাই বাচ্চাদের অবশ্যই বাবার শ্রীমৎ অনুসারেই চলা উচিত। জাগতিক লোকেরা পায় শঙ্করাচার্যের মত, আর বি.কে.-রা পায় এই শিবাচার্যের মত। যেহেতু বি.কে.-রা যে শিবাচার্যের সন্তান। যা অন্যেরা কেউ তা জানেই না। তারা কিন্তু একথাও বলে- পরমাত্মা তো জ্ঞানের সাগর, তিনি তো শিক্ষকদেরও শিক্ষক। শঙ্করাচার্য তো একজন শিক্ষক মাত্র। সন্ন্যাসীরা অনেক শাস্ত্র পাঠ করার পর নানা উপাধিতে ভূষিত হয়। কিন্তু তবুও তাদেরকে কৃষ্ণ-আচার্যও বলা যায় না। আর শিবের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য তো তারা জানেই না। তারা তাদের প্রকৃত (অলৌকিক) পিতাকেই তো জানে না। একমাত্র এই বাবাকে ছাড়া, আর কারওকেই জ্ঞানের সাগর বলা যায় না। সন্ন্যাসীদের

সাথে দেখা হলে তাদেরকে বলবে, তারা তো নিবৃত্তি-মার্গের হঠ্-যোগী সন্ন্যাসী। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা হলে সংসার ধর্মে থেকেও প্রবৃত্তি-মার্গের রাজ-যোগী। যদিও তোমরা অন্যদেরকে সেই রাজযোগ শেখাতে পারো না। জাগতিক সন্ন্যাসীরা হয় রজোগুণের, কারণ শঙ্করাচার্যের আগমনই তো ঘটে দ্বাপরে। তাই তাদের হঠ্-যোগও হয় কর্ম-সন্ন্যাস রূপে। বাস্তবে কর্ম-সন্ন্যাস বলে কিছু হয় না।

বাবা এবার ওঁনার বি.কে. বাচ্চাদেরকে আরও কিছু ভিন্ন ধরণের নির্দেশ দিয়ে জানাচ্ছেন - মানুষ তো চায় শান্তিতে থাকতে। তাদেরকে বলো- তোমরা নিজেদেরকে তোমাদের ইন্দ্রিয়গুলির বন্ধনমুক্ত হয়ে নির্লিপ্ত ভাব হয়ে যাও। অবশ্য কেবলমাত্র তা হলেই ফলপ্রসু হবে না, ইন্দ্রিয় থেকে বন্ধনমুক্ত নির্লিপ্ত হয়ে বাবার স্মরণে থাকতে পারলেই, বিকর্মগুলিও বিনাশ হতে থাকবে। ফলে তখন শান্তি হবে হবে তোমার গলার মালা। আত্মার স্ব-ধর্মই যে হলো শান্তি। এই আত্মাই নিরাকারী রূপে মূল-বতনের নির্বাণ বা অব্যক্ত বতনে থাকে। এরপর আকারী (মুভী) রূপে আসে সূক্ষ্ম-বতনে। আর এখানকার এই স্থুল-বতন হলো সাকারী (টকী) বতন। অর্থাৎ যা আকার ও শব্দের জগৎ। যে সাক্ষ্যাৎকারের অভিজ্ঞতা বি.কে.-দের আছে। সেই সাক্ষ্যাৎকারের অনেক অভিজ্ঞতা আছে ব্রহ্মা-বাবার। যদিও মাম্মার কোনও সাক্ষ্যাতকার হয়নি। এমন কি মাম্মা কখনও ধ্যানের সমাধিতেও যাননি। কিন্তু জ্ঞানে তিনি ছিলেন ভীষণ পারদর্শী। তাই ধ্যানে সমাধিস্থ হওয়ার আগ্রহ থাকা উচিত নয়। একবার ভেবে দেখো, ধ্যান-সমাধিতে না গিয়েও মাম্মা কত এগিয়ে গেছেন। যা সর্ব্বোচ্চ শিখরে অর্থাৎ প্রথমে, শ্রী লক্ষ্মী রূপে, তারপরের স্থান শ্রী নারায়ণের। এনার (ব্রহ্মার) উদ্দেশ্যেই কিন্তু প্রবাদ লেখা হয়েছে- অর্জুনের যেমন বিনাশের সাক্ষ্যাৎকার হয়েছে তেমনি আবার স্থাপনার সাক্ষ্যাৎকারও হয়েছে। এনার রথেই শিববাবা রথী হয়ে বসে সবাইকে জ্ঞান শোনান। সেই সঙ্গে এই রথও (ব্রহ্মা) সেই জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে থাকে। পূর্বেও কিন্তু এই ব্রহ্মা নিয়মিত গীতা পাঠ করতেন। অনেক ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক সভা-সমিতিতেও যেতেন। এখন উনি আশ্চর্য হয়ে যান, শাস্ত্রগুলিতে কি না কি সব লেখা আছে এই কথা ভেবে। তাই তো বাবা বলেন- পূর্বে তোমরা যা কিছুই পড়েছো, এখন তা ভুলে যাও, অন্য কিছুই আর শুনবে না, সবকিছু দেখেও তা যেন দেখছো না। কেবল একটা কথাই মনে রাখবে, তোমাকে এবার নিজ বাবার ঘর যা বাচ্চারও ঘর, অর্থাৎ শান্তিধামে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ না গাইড-পাণ্ডা এবং মুক্তিদাতা আসবে, ততক্ষণ কেউ-ই যেতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের পাণ্ডা আর মুক্তিদাতা এই এক ও একমাত্র এই বাবা-ই। যিনি তোমাদের দুঃখ-কষ্ট থেকেও মুক্ত করেন। আর এই কারণেই ওনাকে গতি-সদগতি দাতা বলা হয়। উনি-ই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ অর্থাৎ সুপ্রীম-সোল বা পরম-আত্মা। নিরাকারী দুনিয়াই আত্মাদের প্রকৃত নিবাস ধাম। এমনটা কিন্তু মোটেই নয় যে, ব্রহ্ম-তত্বেই পরমাত্মা আর আত্মারা তাতেই বিলীন হয়ে যায়। সত্যি কি চমৎকৃত কথা এটা। কর্মফল অনুযায়ী তোমাদের আত্মার মধ্যেই অবিনাশী ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট থাকে। যাকে কেউ মুঝে ফেলতে পারে না। এই সৃষ্টি-জগত-ও রচিত হয়েছে অনাদি সৃষ্টি রূপে। সত্যযুগকেই নতুন সৃষ্টি-জগৎ বলা হয়। যা এখন খুব পুরোনো হয়ে গেছে। এর অর্থ এই নয় যে, সৃষ্টি-জগৎ-এর বিনাশ হয় না

বাবা আসেন পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানাতে। সৃষ্টি-জগৎ কিন্তু পূর্বের অবস্থানেই থাকে। যারা দেবতা-ধর্মের, তাদের তো অবশ্যই ৮৪-জন্ম হয়। অন্যদের অনেকটাই কম হয়। খ্রীষ্টানদের বা অন্যদের কত জন্ম হতে পারে, হিসেব করে তা বের করতে পারো। বাস্তবে ভারতবাসীদের জনসংখ্যাই সর্বাধিক হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতবাসীরা অন্যান্য নানা ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার কারণে প্রকৃত

সংখ্যাটা কম হয়ে যায়। ভারতবাসীরা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। বাবা জানাচ্ছেন, তাই তো তিনি সেই সময়কালেই আসেন, যখন এই ব্রহ্মার দ্বারা দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং শংকরের দ্বারা বিনাশ ..... তারপর স্থাপনার কার্য ও পালনার কার্য করাবার জন্য। এমন কি গান্ধীজীকেও যে বা যারা সহায়তা করেছিল, কত কষ্টও করেছিল, আজ তারা খুবই সুখে আছে। আর সেখানে ভগবানের সহযোগীরা তো সবাই সুখেই থাকবে। কিন্তু সেখানেও পদের তারতম্য থাকে। যারা লাগাতার বাবার স্মরণে থেকে বাবার আশীর্ব্বাদী-বর্সাকে লাগাতার স্মরণ করে, একমাত্র তারাই হবে সূর্য-বংশী। আর যারা কম স্মরণে থাকে তারা হয় চন্দ্র-বংশী। আর তার চাইতেও কম যারা, তারা কেউ প্রজা, কেউ বা দাস-দাসী ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন অনেক প্রকারেরই তো প্রয়োজন। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, একমাত্র যোগবলের দ্বারাই যে কেউ সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে পারে। তোমরা বি.কে.-রা হলে যোগবলের অহিংসক সেনানী। খ্রীস্টানদেরও এই যোগ বলের শক্তি পেলে, তারাও বিশ্বের মালিক হতে পারে। কিন্তু অবিনাশী ড্রামার নিয়মে যদিও তা নাই। যেমন বাঁদরের এক গল্প আছে না! মাখন কিন্তু কৃষ্ণের মুখেই পড়ে, অর্থাৎ কৃষ্ণের ভাগ্যেই সেই রাজ্য-ভাগ্য। যেহেতু, সমগ্র বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্তি হয় একমাত্র যোগবলের দ্বারাই। বাবা জানাচ্ছেন, এই উদ্দেশ্যেই তো উনি স্বর্গ-রাজ্যের রচনা রচেন। বাচ্চারা, তোমাদেরও সেই উদ্দেশ্য থাকা উচিত। যেহেতু তোমরা এই বাবারই সন্তান, অতএব বাবার এই স্থাপনা কার্যে তোমাদেরও সহযোগীতা করা উচিত। .... আচ্ছা !
ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সদা হর্ষিতমুখ, প্রসন্নচিত্তে থাকতে হবে। কোনও কারণেই কখনও কাঁদবে না যেন। জীবিত থাকাকালীনই সবার থেকে বিদায় নিয়ে নিতে হবে। কারও জন্যই কোনও চিন্তা করবে না।

২) শান্তি তোমার স্বধর্ম, তাতেই স্থিত রাখবে নিজেকে। জ্ঞান আর যোগে নিজেকে এগিয়ে রাখতে হবে। ধ্যানের সমাধির জন্য কোনও আগ্রহ করবে না।

বরদান :- অন্তর দিয়ে বাবাকে খুশী করে এবং নিজেও সদা খুশীতে থেকে রাজযুক্ত (রহস্যের জ্ঞানযুক্ত) হও

বিস্তার :- যে বাচ্চা মন-প্রাণ দিয়ে বাবাকে খুশী করে, বাপদাদা তাকে নিজের সংস্কারের দ্বারা, সংগঠনে সদা খুশী অর্থাৎ রহস্যের জ্ঞানযুক্ত সংস্কারে থাকার বরদান দেন। নিজের কিম্বা একে অপরের সংস্কারগুলির রহস্যকে জানা, পরিস্থিতি-গুলিকে জানা - এই হলো রাজযুক্ত স্থিতি। অন্তর থেকে বাবাকে নিজের চার্ট বা পোতামেল দেওয়া বা স্নেহের আত্মিক আলোচনা করলে, সদা বাবার সমীপে আছো এমন অনুভব হয় এবং পূর্বের কর্মফলের হিসেব-নিকেশের পরিসমাপ্তি ঘটে।

স্লোগান :- অন্তরাত্মা থেকে যে - দাতা, বিধাতা, বরদাতাকে খুশী করতে পারে, সে ঈশ্বরীয় আনন্দে থাকে।

যোগ = Yoga, Contact, Connection.
যোগ সমাধি = Trance. (Half-
. Conscious state)

যোগে আচ্ছন্ন = Meditation.
যোগবল = Spiritual Power

. !! ওঁম্ শান্তি !!